ছবির ভাষা, ছবির ভাষ্য

ছবি নিয়ে লেখা পড়ার পর তার পাঠ-প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন মোনালিসা সাহা। বাংলায় এক অন্যধারার বইয়ের খোঁজ এই লেখায়।

কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্তের *ছবি নিয়ে লেখা* বইটির নামই বইটির বিষয়বস্তু নির্দেশিত করে। বিষয়বস্তুর কথা মাথায় রেখেই বইটির প্রচ্ছদও নির্মিত হয়েছে। ছোট ছোট বাক্যাংশ দিয়ে সেজে উঠেছে প্রচ্ছদটি। সেই বাক্যাংশগুলিই পাঠককে আভাস দেয় বইয়ের বিষয়বস্তুর। শব্দের ব্যবহার না থাকলেও একটি ছবি কতরকমভাবে তার দর্শককে ভাবায়। একটি ছবি কতই না বর্ণনা, গল্প, আবেগ, স্থিরতা, চঞ্চলতা প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে। লেখক ছবির মধ্যে সুপ্ত সেইসকল না বলা কথাগুলিকেই তুলে ধরেছেন তাঁর সহজবোধ্য ভঙ্গিমায়, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায়। এই বইটির প্রতিটি লেখাই প্রথমে *ঝড়* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে বই হিসাবে আত্মপ্রকাশ ২০১১ সালে।

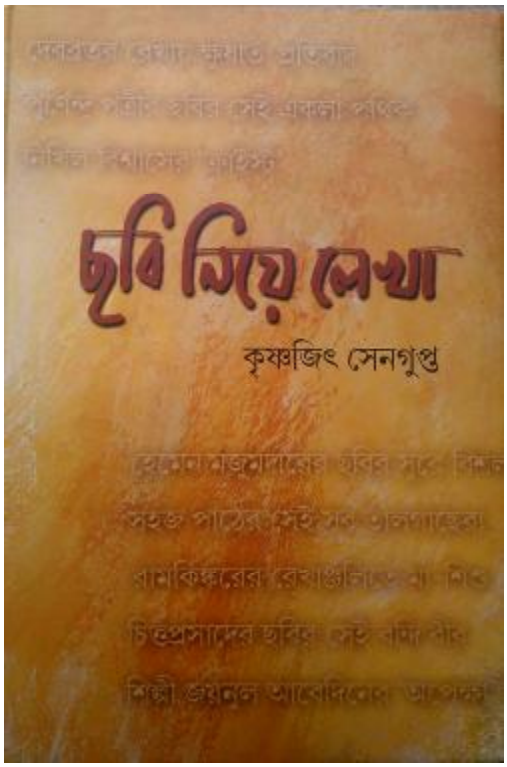

বইটির প্রথম অংশে কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের আঁকা *অনন্তের সুর* নামক একটি ছবিকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। মোনোক্রোমে আঁকা এই ছবিতে এক ভবঘুরে গানওয়ালা সারিন্দা বাজাচ্ছে। সে না জানি কত পথ, কত গ্রাম ঘুরে এসেছে। তার পোষাক মলিন, চুল এলোমেলো। সে হয়তো কোনো প্রাচীন লোকগাথা গাইছে। বর্তমানের অস্থির সামাজিক পরিস্থিতিতে লোভ, হিংস্রতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির কারনে পৃথিবী থেকে রং ধীরে ধীরে উবে যাচ্ছে। সে কারনে এ ছবিতেও আমরা রং দেখতে পাইনা। তবে লেখক আশা করেছেন যে, এই গানওয়ালার গানই একদিন পৃথিবী পাল্টে দেবে। পৃথিবী নিজের রং ফিরে পাবে, মানুষ হিংসা ভুলে আবার ভালোবাসতে শিখবে। এই গানওয়ালার কাছে তার সারিন্দা, তার গানই যেন হাতিয়ার। সে যেন এক নীরব যোদ্ধা – যে তার গানের সুরেই পৃথিবীকে পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, চাওয়া-পাওয়াতে নানা পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক যুগের শুরু থেকেই মানুষ ভোগবাদকে গুরুত্ব দিতে থাকে অতিমাত্রায়। ধীরে ধীরে মানবিকতা মুছে যেতে থাকে এবং ধন সম্পত্তি যে

কোনো উপায়ে কুক্ষিগত করাই প্রাধান্য পেতে থাকে। ছবিতে গানওয়ালার নিজের জীবন হয়তো অনাড়ম্বর, কিন্তু সে পৃথিবীতে ভালোবাসার বাতাস বইয়ে দিতে পারে। দুর্ভাগ্য এই যে, এতবড় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও সে সভ্য মানবসমাজে গুরুত্বহীন। কারন, তার কাছে অর্থের ক্ষমতা নেই। এ সমাজে সবকিছুকে মূল্যায়ন করতে কেবল অর্থের মাপকাঠিই ব্যবহৃত হয়।

লিনোকাট পদ্ধতিতে আঁকা নন্দলাল বসুর ছবিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *সহজপাঠ*-এর প্রথম ভাগের জন্য আঁকা। খুবই সহজ সরল ছবিটি – গাছ ও ছোট ছোট ঝোপ। কোনো গাছ একটু কাছে, কোনোটি একটু দূরে। স্থির হয়ে তারা সবাই দাঁড়িয়ে আছে। খুবই চেনা ছবি, যেটা আমরা শহর থেকে একটু দূরে গেলেই দেখতে পাই। তাদের দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অন্ত নেই। সারাদিন তারা একইভাবে দাঁড়িয়ে – তা সে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনই হোক বা বৃষ্টিস্নাত দিন। এখানে লেখক বলছেন, আমরা কেবল গাছেদের দাঁড়িয়ে থাকাই লক্ষ্য করি। তাদেরও যে নিজস্ব জীবনযাপন, দৈনন্দিন কাজকর্ম রয়েছে তাকে আমরা গুরুত্ব দিই না। দিনের আলোর সঙ্গেই তারা জেগে ওঠে। এরপর সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে নিজেদের খাবার তৈরী করে তারা। ধীরে ধীরে দিনের শেষ হয়ে এলে যখন সকল প্রাণীজগৎ বিশ্রামের জন্য আশ্রয়ে ফেরে, তখন তারাও বিশ্রাম নিতে শুরু করে। এভাবেই এগিয়ে চলে তাদের জীবনচক্র।

রামকিঙ্করের আঁকা স্কেচধর্মী ছবিটিতে আমরা দেখতে পাই দরিদ্র পরিবারের মা দড়ির খাটিয়ার ওপর বসে তার সন্তানকে দুহাতে তুলে ধরে আদর করছে। তাকে সংসার চালানোর জন্য কখনও হয়তো ইঁটভাটায়, কখনও বা খামার বাড়িতে কাজ করতে হয়। এরপরেও থাকে সংসারের নানা খুঁটিনাটি কাজ, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সেবা করা। কাজের এত বড় পাহাড় পেরিয়ে আসার পর তবে সে সময় পায় তার সন্তানকে একটু স্নেহ করার। দারিদ্র ও অতিরিক্ত খাটুনির ফলে যদিও তার শরীরে লাবণ্যের রেশমাত্র নেই, তবু তার সন্তানের প্রতি স্নেহে এতটুকু কমতি নেই। দিনের শেষে বহু সময় পর শিশুটিও তার মাকে কাছে পায়। সেও উপভোগ করতে থাকে মায়ের ভালোবাসা। ছোটোবেলা থেকেই সে মাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে দেখে। অক্লান্ত পরিশ্রম করা মায়ের রুক্ষ, শক্ত হাত পা দেখতে দেখতে সে বড় হয়ে ওঠে। তার কোমল শরীরে মায়ের পরিশ্রমের ঘ্রাণ সঞ্চারিত হয়। সেও জেনে যায় যে, পরিশ্রমই জীবনে টিঁকে থাকার একমাত্র পথ। পরবর্তীতে জীবনযুদ্ধে পরাজিত হতে থাকলে সর্বপ্রথম মাকেই সে স্মরণ করে। এছাড়া কখনও অসহায়তার মূহুর্তে কখনও বা নিছকই সে মাকে সম্বোধন করে। মা-ই তো প্রত্যেকের শক্তি সাহসের উৎস। কত রূপেই না তিনি ধরা দেন। অতীব দারিদ্রও তার স্নেহ মমতাকে প্রভাবিত করতে পারে না। অপার শক্তির উৎস মমতাময়ী মাকেই রামকিঙ্কর তাঁর চিত্রে তুলে ধরেছেন।

শিল্পী চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্যের ছবিটিতে কারাগারে বন্দী এক মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *আমার বাংলা* বইয়ের জন্য ছবিটি আঁকেন শিল্পী। তাঁর বই থেকেই ছবিটির উৎস পাওয়া যায়। ইংরেজদের কবল থেকে যারা ভারতকে মুক্ত করতে চেয়েছিল, তাদেরকে ইংরেজরা বন্দী করে রেখেছিল। এই বন্দীও হয়তো সেরকমই কোনো বীর যে ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে নিজেকে ও বাকি দেশবাসীদের স্বাধীন করতে চেয়েছিল। মজবুত দেওয়ালে তৈরী এক কারাগারে রয়েছে বন্দীটি। একটি খুবই ছোট প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখা হয়েছে তাকে। দীর্ঘকায় সেই বন্দীকে বহু কষ্টে সেখানে দিন কাটাতে হয়। ছোট ছোট কিছু ঘুলঘুলিই বাইরের বাতাস ভেতরে আসার একমাত্র পথ। সমগ্র জগৎ থেকে তাকে পৃথক করে রেখে তার স্বাভাবিক জীবনযাপনকে রুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে ক্ষমতাবান শাসকরা। তবু দৃঢ়ভাবে বসে রয়েছে সে। তার সজল চোখদুটোতে রয়েছে লড়াইয়ের দৃপ্ততা। বাইরে সে নিজে যেতে না পারলেও তার মন চলে যায়। কাঁটাতারের উঁচু পাঁচিলের ওপারে কিছু কাঁচা বাড়ি দেখা যায়। সেখানে হয়তো কোনো পরিবার সুখে দুঃখে দিন কাটাচ্ছে। বন্দীরও হয়তো কোনো পরিবার ছিল। আজ তাদের থেকে সে বিচ্ছিন্ন। আকাশে কিছু কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে। ছবিটির আলোচনা করতে গিয়ে লেখকের মনে হয়েছে, মেঘগুলিও যেন বন্দী বীরের দুঃখে বিষণ্ন। ছবিটি অসংখ্য ছোট ছোট রেখার সমাহারে সৃষ্ট। অজস্র ছোট রেখাগুলি যেন কাঁটার মত দৃষ্টিতে বেঁধে মনকে রক্তাক্ত করে তোলে, বন্দীর মনের অশান্ত পরিস্থিতির কথাই যেন মনে করিয়ে দেয়।

শিল্পী জয়নুল আবেদিনের কালিতুলি দিয়ে আঁকা ছবিতে একটি গ্রাম্য মেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তার বয়স হয়তো আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে। ঘরের বাইরে দেখা যায় শুকনো উঠোন। একটু দূরে কিছু ঝোপ-জঙ্গল রয়েছে। উন্মুক্ত আকাশে কিছু পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। সেই সীমাহীন আকাশেই সে তাকিয়ে। একমনে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেও কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে। হয়তো সে মেঘের আশায় তাকিয়ে আছে। গত বছর বৃষ্টির অভাবে চাষ ভাল হয়নি।তার বাবা হয়তো ভাগচাষী। অভাবের সংসারে বৃষ্টিই একমাত্র আশা। বৃষ্টি ভাল হলে তবেই ভাল ফলন হবে। কিংবা সে হয়তো ভাবছে তার স্বামীর কথা। সে হয়তো মুক্তিযোদ্ধা। বহুদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। এর ওর মুখ থেকে নানা খবর শোনে, তবে কোনটি সঠিক কে জানে। স্বামীর চিন্তায় মগ্ন সে। সে জানে না আর কতদিন তাকে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। নারীকে কত কারনেই না অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষা যেন নারী-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের কালিকলমে আঁকা ছবিটিতে আমরা একটি মুখ দেখতে পাই। সে চিৎকার করছে ক্ষুধায়। রেখার দৃঢ়তায় সেই চিৎকার গর্জনে পরিণত হয়েছে। তার জিভ ও দাঁত দেখা যাচ্ছে। তার একটি হাত মুষ্টিবদ্ধ। এই ছবিটিতে এক্সপ্রেশনিজমের ছোঁয়া আছে। মানুষের সাধারণ আবেগ, অনুভূতিকে তীব্রতার সঙ্গে প্রকাশ করা হয় অঙ্কণের এই

বিশেষ শৈলীতে। বাস্তবতা থেকে একটু সরে আসে এই ছবি। ছবিটির নাম *Hungry Soul* বা *ক্ষুধার্ত আত্মা* । প্রকৃতি জীবের স্বাভাবিক চাহিদা ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য অঢেল উপকরণ ছড়িয়ে রেখেছে সর্বত্র। শুধুমাত্র বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া সে কিন্তু কৃপণতা করে না। প্রতিটি জীবের খাদ্যের উপর সমান অধিকার আছে। তবে সভ্যতার নামে মানুষের মধ্যে বিভেদ বেড়েই চলেছে। একদল মানুষ খেতে পায়, অন্য দল মানুষ সামান্য ক্ষুধাটুকু মেটাতে নানা বাধার সম্মুখীন হয়। চাকর, ক্রীতদাস হয়ে তাকে কত লাঞ্চনাই না সইতে হয়। তবে প্রকৃতি তো তার সকল সন্তানকে জীবনধারণের জন্য উপযুক্ত খাদ্যের সমাহার রেখেছে। কিছু ক্ষমতালোভী মানুষ নিজেদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে, যারা সভ্যতার অগ্রগতির চাকাকে সচল রেখেছে তারাই দুমুঠো খাবার জোগাড় করতে পারে না। তাদের কাছে খাদ্য জোগাড় করা এতটাই দুঃসাধ্য যে খাবার পেলে বিনিময়ে তারা সবকিছু দিতে রাজী, এমনকি দেশের স্বাধীনতাও। মন্বন্তরের সময় ধনীর বাড়ির উৎসবে দেখা যায় খাদ্যের বিপুল অপচয়। অন্যদিকে হাজার হাজার মানুষ ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সামান্যতম খাবারটুকু সংগ্রহ করতে পারে না। ছবিটিতে মানুষটির চিৎকার হয়ে ওঠে সারা বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের গর্জন। সেই গর্জন যেন বিদ্রোহের রূপ নেয়। তার মুষ্ঠিবদ্ধ হাত যেন বিদ্রোহেরই হাত। বহুকাল ধরে অত্যাচার সইতে সইতে একদিন তারা নিশ্চয় রুখে দাঁড়াবে ও তাদের প্রাপ্য অধিকার, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নূন্যতম খাদ্য ছিনিয়ে আনবে। সেই সময় কোনো শক্তিই তাদের আটকাতে পারবে না।

পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা ছবিটিতে আমরা একলা একটি পথিককে দেখতে পাই। সে ফুটিফাটা মাঠের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সেখানে প্রাণের আর কোনো চিহ্ন নেই। তার পিছনে রয়েছে দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর ও সীমাহীন আকাশ। সে হয়তো কোনো বিপ্লবী। প্রচলিত প্রথার হাত থেকে রেহাই পেতে সে চলেছে সুদূর অজানায়। তার রক্তমাখা পা নিয়ে সে এই আশায় হেঁটে চলেছে যে, যদি তার রক্তের স্পর্শে কোনো বীজ ভিজে ওঠে ও তা থেকে নতুন প্রাণের জন্ম হয়, কিংবা সে হয়তো কোনো প্রেমিক। তার প্রেমিকাকে কে বা কারা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সে হন্যে হয়ে খুঁজছে তার প্রেমিকাকে সতীহারা শিবের মতো। তার চুল এলোমেলো, চোখ রক্তবর্ণ। প্রেমিকাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত সে শান্ত হবে না।

নিখিল বিশ্বাসের ছবিতে দেখা যায় তীরবিদ্ধ যীশুকে। তিনি প্রেক্ষাপটে ক্রশ আঁকেননি। যীশু এখানে শূন্যে ভাসমান। মাথায় তাঁর কাঁটার মুকুট। সারা দেহ জুড়ে অসংখ্য ধারালো তীর তাঁকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। মাংস ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছে পাঁজরে। অসহ্য যন্ত্রণায় নিশ্বাস নেবার জন্য ছটফট করার মত শক্তিও তার নেই। দুহাত প্রসারিত করে তিনি যেন শূন্যতাকে ধরে আছেন। দুচোখ মেলে দেখার ক্ষমতা নেই। তবু যেন মনে হয় মমতামাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন পৃথিবীর দিকে। প্রতিদিনের আঘাত, বিশ্বাসঘাতকতা,

লাঞ্ছনায় জর্জরিত নিজেদের জীবনের সঙ্গে আমরা যেন মিল খুঁজে পাই যীশুর। আমাদের সত্ত্বাও তো কত কষ্টে ভারাক্রান্ত, কত বেদনা তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। এক দরিদ্র মেষপালক যীশু ছিলেন তাঁর চিন্তা ও দার্শনিকতায় একাকী, নিঃসঙ্গ। কাছের মানুষের বিশ্বাসঘাতকতাই তার জীবনে চরম, দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে আসে। আমরাও তো সমাজ জীবনে ভিড়ের মধ্যে একাকী। কখনও কখনও আপনজনের বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের জীবনেও নানা ঝড় নিয়ে আসে। ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াও আমরা দেশ ও সমাজ জীবনেও হিংস্রতা, বিশ্বাসঘাতকতা দেখতে পাই। এক্ষেত্রে বহু মানুষের জীবন একসাথে বিপর্যস্ত হয়। যীশুর এই যন্ত্রনায় ভারাক্রান্ত ছবি দেখতে দেখতে মনে হয় যেন তাঁর দেহে বিদ্ধ তীরগুলি ধীরে ধীরে তুলে দিই। তাঁর ক্ষতগুলিকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করি। মানব সভ্যতাকে আবার যেন ভালোবাসতে ইচ্ছো করে।

সত্যজিৎ রায়ের আঁকা ছবিটি *পথের পাঁচালী*-র কিশোর পাঠ্য সংস্করণ *আম আঁটির ভেঁপু*-র চতুর্থ ছবি। অপু ও দূর্গা দুই ভাইবোন মিলে কালবৈশাখী ঝড়ের সময় এক আম-কাঁঠালের বাগানে এসেছে আম কুড়াতে। বাগানের কাছাকাছি কোনো জনবসতি নেই। ঝড়ে উত্তাল হাওয়া বইছে। একসময় চারিদিক অন্ধকার করে জোরে বৃষ্টি নেমে আসে। দুই ভাইবোন আশ্রয় নেয় এক গাছের তলায়। ছবিতে দেখা যায় দূর্গা তার আঁচল দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করছে অপুকে। তাদের কুড়ানো কয়েকটি আম তাদের কাছেই পড়ে আছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলিকে তিনি একটু বাঁকাভাবে এঁকেছেন যাতে বোঝা যায় যে বৃষ্টিতে ছাট আছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আকাশ দেখা যায় তা ঘন কালো রঙের। হেঁটে যাওয়ার আঁকাবাঁকা রাস্তায় জল জমে তা নদীর মতো দেখাচ্ছে। এলোমেলো হাওয়ার দাপট বড় বড় গাছের মাথাগুলিকে নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে মাঝে মাঝেই ভীষণ শব্দে মেঘ গর্জন করছে। প্রকৃতির এই রুদ্র রূপ দেখে দুই ভাইবোন খুবই ভয় পেয়েছে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর সুন্দর থেকে কিছুতেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না। দুচোখ মেলে তারা প্রকৃতির এই অদ্ভুত রূপ দেখছে। ছবিতে ভাইবোনের নিবিড় সম্পর্কের দিকটি ফুটে উঠেছে। ভীত ছোট ভাইকে দিদি আগলে রেখেছে নিজের আঁচলের শেষ প্রান্তটুকু দিয়ে, যদিও সে নিজেও ভয় পেয়েছে। ছবিতে গাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছে দুই ভাইবোন। দিদি আবার তার ভাইকে আশ্রয় দিয়েছে। এ যেন এক স্নেহপ্রবাহ, ভালোবাসা ও আশ্রয়ের নিশ্চিন্ত ঠিকানা। মানুষ সারাজীবন তো এই নিশ্চিন্ত আশ্রয়েরই সন্ধান করতে থাকে। ছবিটি অলঙ্করণ হিসাবে ব্যবহৃত হলেও এর নিজস্ব একটি অস্তিত্ব রয়েছে। শুধু ছবিটিই মানুষের কাছে স্নেহ ও ভালোবাসার বার্তা পৌঁছে দিতে পারে।

বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি নিয়ে এই কাজ সত্যিই উল্লেখের দাবী রাখে। বাংলা ভাষাতে এমন কাজের সংখ্যা খুবই নগন্য। সেক্ষেত্রে বলা যায় চিত্রকলা নিয়ে বাংলা ভাষায় রচিত বইগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন এই বইটি। এই বইতে মূলত সাদাকালো ছবি

নিয়ে আলোচনা হয়েছে। একটি ছবি কতকিছুই ইঙ্গিত করে। লেখক কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত নিজেও একজন শিল্পী। তিনি এখানে অনেক ইঙ্গিতই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন সহজবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায়, উপযুক্ত শব্দ চয়নে। তাঁর চিন্তার প্রবাহ সত্যিই সুখপাঠ্য। আশা করা যায় ভবিষ্যতে তিনি রঙিন ছবি নিয়েও এমন কাজ করবেন। ছবিতে রঙের খেলা আরও নতুন নতুন ব্যাখ্যা আনবে নিশ্চয়।

বই : ছবি নিয়ে লেখা; লেখক : কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত; প্রকাশক : কবিতা পাক্ষিক; মূল্য : ৫০ টাকা